2015

প্রঃ- চন্ডীমঙ্গলকাব্যের বিভিন্ন অংশে কবির সমাজ-সচেতনতার পরিচয় :-

ভূমিকা: সাহিত্য কখনই সমাজ বিচ্ছিন্ন নয়, তাই তো সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে ফুটে ওঠে সমকালীন সমাজ জীবন। যদিও মঙ্গলকাব্যগুলি ধর্মকে কেন্দ্র করে রচিত হলেও এতে দেশকাল পটভূমিকে একেবারে বাদ দেওয়া হয়নি। সমাজ-জীবন বিচ্ছিন্ন সাহিত্য অমূল বৃক্ষের মতই অলীক। এই কারণে মঙ্গল-কাব্যের অন্যান্য কবিদের মতই কবিকঙ্কন মুকুন্দরামের "অভয়ামঙ্গল" বা 'চন্ডীমঙ্গল' কাব্যেও সমকালীন বাস্তব জীবন-এর নানা উপাদান চিত্রিত হয়েছে। এখানে কবির জীবনবোধ, পর্যবেক্ষন শক্তি, বাস্তব জীবনের নিজস্ব অভিজ্ঞতা, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা ও ধর্মীয় বিশ্বাস প্রতিফলিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে চন্ডীমঙ্গলের বিভিন্ন পর্যায়গুলি অবলম্বনে কবির সমাজ-সচেতনতা সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

পশুগনের ক্রন্দন :-

'পশুগনের ক্রন্দন' অংশে দেখতে পাই বনের পশুরা দেবী চন্ডীর কাছে ব্যাধ কালকেতুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করছে। এই বর্ননা বেশ অদ্ভুত ও হাস্যকর। কিন্তু এর মধ্য দিয়ে কবি তাঁর ব্যক্তিগত জীবন অভিজ্ঞতার প্রতিচ্ছবি তুলে ধরেছে পশুদের উপর মানব চরিত্র আরোপ করে। ভাল্লুকের কথাতেই তা স্পষ্ট —

" উইচারা খাই আমি নামেতে ভাল্লুক।
নেউগী চৌধুরি নই না করি তালুক॥"

ভাল্লুকের কাহিনীতে ডিহিদার ব্যবস্থায় উপদ্রুত কবি ও নিরিহ প্রজাদের অত্যাচারের কথাই তুলে ধরা হয়েছে।

এছাড়াও অন্যান্য সকল পশুদের কান্নার আড়ালে আমরা খুঁজে পাই তৎকালীন শাসক শ্রেনি দ্বারা শোষিত হতভাগ্য প্রজাদের করুন আর্তনাদ —

"বরাহ বলেন মুখা আমার ভক্ষন।
কার হিংসা নাহি করি নাহি প্রয়োজন॥
. ...
শাশুড়ী ননদ মরে দেওর ভেয়ুর।
পতি গেল রতিসুখ বিধি কৈল দূর॥"

চণ্ডীর নিকট পশুগণের দুঃখনিবেদন :—

'চণ্ডীর নিকট পশুগণের দুঃখ-নিবেদন' অংশে দেখি বাস্তব জীবনের অপর একটি রূপ। যেখানে দুর্বল, অক্ষম প্রজারা দুরন্ত শাসক ব্যক্তির দ্বারা উৎপীড়িত হয়েছে এবং পরিণামে নিশ্চিত আশ্রয়স্থল লাভের জন্য দেব-দেবীর শরণাপন্ন হয়েছে। পশুরাজ সিংহের জবানীতে তা লক্ষণীয় —

"কহে বীর মৃগরাজ   কহিতে বাসয়ে লাজ
কালকেতু লোটিল দশন।
কৃপাকর কৃপাময়ি   তোমার বাহন হই।
জীবনে নাহিক প্রয়োজন॥"

এই উদ্ধৃতি অনুসারে কালকেতু সেই উৎপীড়ক ব্যক্তির প্রতিনিধি এবং পশুগণ শোষিত-নিপীড়িত লোকসাধারণ।

বুলান মণ্ডলের প্রতি কালকেতু :—

কবি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অরাজকতার ফলে তাঁর সাত-পুরুষের ভিটা ত্যাগ করে পথে নামতে বাধ্য হয়েছেন ছিল। এই অবক্ষয়িত সমাজব্যবস্থাকে সুন্দর রূপ দানের উদ্দেশ্যেই কালকেতুর নগরপত্তন ও প্রজাপত্তন ব্যাপারে চিন্তাশীল। এখানে সামন্ততন্ত্র থাকলেও তা স্বেচ্ছাচারী নয়। নতুন নগরে প্রজাদের সুযোগসুবিধা দানের মধ্য দিয়ে কালকেতুকে হিতকারি রাজা হিসাবে চিত্রিত করেছেন। 'বুলান মণ্ডলের প্রতি কালকেতু' অংশে তা প্রকাশ পেয়েছে —

"আমার নগরে বৈস   যত ইচ্ছা চাষ চষ
তিন সন বহি দিহ কর।
হাল প্রতি দিবে তঙ্কা   কারে না করিও শঙ্কা
পাট্টায় নিশান মোর ধর॥"

কিন্তু কবি কল্পিত এই সুব্যবস্থা সেকালে ছিলনা বললেই চলে। কবি নিজ জীবন দিয়ে প্রজাদের যে নিদারুণ অবস্থাকে অনুভব- P.T.O

করেছিলেন তারই বহিঃপ্রকাশ ~~অত~~ কবি এই কল্পনায় ধরা পড়েছে।

কালকেতুর ভোজন :—

'কালকেতুর ভোজন' অংশে বাস্তব জীবন চিত্রের সাথে সাথে এক নির্মল হাস্যরসের বর্ণনা পাই। এই অংশে দেখি—

"মোচড়িয়া গোঁফ দুটি বান্ধিলেন ঘাড়ে।
এক শ্বাসে সাত হাঁড়ি আমানি উজাড়ে॥
চার হাঁড়ি মহাবীর খায় খুদ জাউ।
ছয় হাড়ি মুসুরী সুপ মিশাইয়া তথি লাউ॥"

এইখানে খাদ্যের পরিমানে যে বাহুল্য রয়েছে এবং যে ~~সকল~~ সমস্ত উপকরণ দিয়ে খাদ্য প্রস্তুত হয়েছে তা একান্তভাবেই ব্যাধ জীবনের উপযোগী। ব্যাধ সম্প্রদায়ের খাদ্যাভ্যাসকেই কবি এখানে তুলে ধরেছেন— তাতে কবির সমাজ-সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়।

উপসংহার — অবশেষে ~~উপরে~~ উপরের আলোচনার ভিত্তিতে বলা যেতে পারে মধ্যযুগীয় গ্রাম বাংলার সাধারন মানুষের বাস্তবজীবন যাত্রা, ধর্মবিশ্বাসের পরিচয় মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে নিখুঁত ভাবে বিবৃত হয়েছে। কবি শুধু বাস্তব জীবন চিত্রই নিখুঁতভাবে অঙ্কন করেননি জীবনের ছাপ অঙ্কন করতে গিয়ে যে সকল বাস্তব উপকরণ ব্যবহার করেছেন তা কবির গভীর সমাজ-সচেতনতাকেই প্রতিপন্ন করে, তাই কবিকঙ্কনের কাব্য প্রসঙ্গে ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য স্মরণীয়—

"…. তাঁহার কৃতিত্ব কেবল বস্তু সংগ্রহে নহে, বস্তুর রসের পরিবেশন নৈপুণ্যে।" (কবিকঙ্কন চণ্ডী)